প্রথম অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পে হাস্যরসের ধারা

পৃথিবীর সকল দেশের সকল সাহিত্যেই হাস্যরস একটু পরে এসেছে। মহাকাব্য রচয়িতা পাশ্চাত্যের হোমার অথবা এ দেশের বাল্মীকি অথবা ব্যাসদেব কেউই তাঁদের মহাকাব্যে হাস্যরসের অবতারণা করেননি। মহাকাব্যের বিষয় একটু গুরুগম্ভীর বলে এবং সেখানে দেবতা অথবা দেবতাতুল্য চরিত্র থাকে বলে হাস্যরস মহাকাব্যে সেভাবে স্থান পায়নি। পাশ্চাত্যে এরিষ্টফেনিস ও প্রাচ্যে কালিদাস বোধহয় সর্বপ্রথম হাস্যরসকে তাঁদের সাহিত্যে যথার্থভাবে স্থান দেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এরপর শেক্সপীয়রের হাতে হাস্যরস যথার্থভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর প্রায় সব নাটকেই হাস্যরসের উজ্জ্বল উপস্থিতি চোখে পড়ে। শেক্সপীয়রের পর মলিয়র, সারভেন্তাস হাস্যরসকে আরও জনপ্রিয় করে তোলেন। সারভেন্তাস তাঁর **'Don Quixote'** উপন্যাসে তো হাস্যরসের ভিন্ন অভিমুখই নির্মাণ করে ফেললেন। এরপর ডিকেনস, কার্লাইল হাস্যরসের জনপ্রিয়তা বহুগুণে শুধু বাড়িয়েই দিলেন না তাঁরা সাহিত্যে হাস্যরসকে এক স্বর্গীয় উচ্চতায় পৌঁছে দিলেন। সে ধারাকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে স্টিফেন লিকক মন্তব্য করেছেন:

> ''The world`s humour in its best and greatest sense is perhaps the highest product of our civilization.''[১ক]

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারণাটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস যে একেবারেই ছিল না তা নয়। প্রাচীন যুগের সাহিত্যে 'চর্যাপদ' থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য—সবেতেই হাস্যরসের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তবে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ছিল মূলতঃ স্থূলতা বা ভাঁড়ামি মাত্র। অধিকাংশ সময়ে তা শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্রকে বাদ দিলে যথার্থ হাস্যরস সৃষ্টিকর্তা প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে সত্যিই বিরল। বাঙ্গালীর অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা, অধিক মাত্রায় দেবদেবীর চরিত্র সৃষ্টি প্রভৃতি কারণে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সেভাবে হাস্যরস জমাট বাঁধতে পারেনি।

এরপর ঊনবিংশ শতাব্দী আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে এলেন একদল নতুন সাহিত্যিক, নতুন সৃষ্টির ডালি নিয়ে। তারা যে হাস্যরস সৃষ্টি করলেন পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট হাস্যরস থেকে তা অনেকটাই আলাদা। হাস্যরস সৃষ্টি করতে গেলে যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি,

জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আস্তিক্যবোধ ও যে এক ধরণের গভীর ও গম্ভীর জীবন দৃষ্টির প্রয়োজন বর্তমান সাহিত্যিকেরা সেই গুণগুলিকে আয়ত্ত করে হাস্যরসপ্রধান রচনা সৃষ্টিতে উৎসাহী হয়েছিলেন। এই সাহিত্যিকদের মধ্যে যাদের নাম করতে হয় তারা হলেন ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১), যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫) প্রমুখ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এরাই হলেন প্রথম যুগের হাস্যরসের শিল্পী। এদের হাত ধরেই বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের ভীত প্রস্তুত হয়েছিল। মনে রাখতে হবে এই সমস্ত সাহিত্যিকেরা যখন সাহিত্য রচনা করেছিলেন তখনও বাংলা ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত হয়নি। তাই বাংলা ছোটগল্পে হাস্যরসের ধারা আলোচনা করার আগে এদের হাস্যরসের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে নেমে এসেছিল চরম দুঃসময়। কবিওয়ালারা কোনরকমে তাঁদের সৃষ্ট মাঝারিমানের একধরণের সৃষ্টি নিয়ে বাংলা সাহিত্যের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই চরম দুঃসময়ে আবির্ভাব হয় কবি **ঈশ্বর গুপ্তের** (১৮১২-১৮৫৯)। তিনি ভারতচন্দ্রের কাব্যের রস ও রীতিকে স্বীকার করে নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গের ঝুড়ি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে পদার্পণ করলেন। বাংলা দেশে সে সময় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইংরেজী ভাষা ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে এ দেশে দ্রুত বিকাশ ঘটেছে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের। পলাশির যুদ্ধ অতিক্রান্ত হওয়ার পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই এই নবাগত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাঙ্গালীর মানসলোককে তীব্রভাবে আলোড়িত করেছিল। একদিকে বাঙ্গালীর প্রাচীন ঐতিহ্য চেতনা অন্যদিকে নবাগত পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ এই দুইয়ের সংঘাতে পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে বাঙ্গালী। যুগের এই সন্ধিক্ষণে 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদক হয়ে আবির্ভাব ঘটে ঈশ্বর গুপ্তের।

সমকালীন সমাজের নানা অসঙ্গতির প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাই সেই অসঙ্গতিগুলিকে বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। আর মেকির উপরে সহজাত ক্রোধ নিয়েই ঈশ্বর গুপ্ত জন্মেছিলেন। জগৎ ও জীবনের যেখানেই তিনি মেকি লক্ষ করেছেন সেখানেই তাঁর শাণিত ব্যঙ্গের চাবুক ঝলসে উঠেছে। ব্রাহ্মণ-নির্দেশিত বাঙ্গালী সমাজ থেকে শুরু করে মিশনারী সম্প্রদায়ের নানা ক্রিয়াকলাপ, রাজনৈতিক ফন্দিবাজী ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের উপর ব্যঙ্গের চাবুক চালিয়েছেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুপ্তের মেকির উপর বিদ্বেষ প্রসঙ্গে বলেছেন :

''তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি সাহেবরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাম্মণ পন্ডিতেরা, ''নস্যলোসা দধি চোসার'' দল, গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টীয়ান হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনারিদের ধর্ম্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্‌সের উপর রাগ।''[১খ]

ঈশ্বর গুপ্তের মেকির উপর এই বিদ্বেষ সবথেকে বেশী প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। রঙ্গরসিকতার মধ্য দিয়ে সমস্ত রকমের মেকিকে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ইংরেজী সভ্যতা, যীশুখ্রীষ্ট ও পাদ্রী আলেকজান্ডার ডাফ সাহেবকে ব্যঙ্গ করে কবির উক্তি :

''ধন্যরে বোতলবাসী, ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতা সকল।।
দেশী কৃষ্ণ মানিনেক ঋষি কৃষ্ণ জয়।
মেরি মাতা মেরিসুত বেরি গুড বয়।।''[২]

সেকালের সখেরবাবুদের ব্যঙ্গ করে ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছেন:

''তেড়া হয়ে তুড়ি মারে, টপ্পাগীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে।।
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটোকাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে।।''[৩]

বেথুন স্কুলের নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে কবির উক্তি:

''আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো, ব্রত ধর্ম করত সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
এখন এ.বি শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে।''[৪]

ইয়ংবেঙ্গলদের নানা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি তাঁর কটাক্ষ :

''সোনার বাঙাল করে কাঙ্গাল ইয়ংবেঙ্গল কত জনা।
সদা কর্তৃপক্ষের কানে গিয়ে লাগায় ফোঁস ফোঁসনা।।
এরা না হিদুঁ না মোসলমান, ধর্ম ধনের ধার ধারে না।

নয় মগ ফিরিঙ্গি, বিষম ধিঙ্গি, ভিতর বাহির যায় না জানা।।'[৫]

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তকে satirist বলেছেন। satire হল বিদ্রূপপূর্ণ হাসি। ঈশ্বরগুপ্তের রঙ্গ রসিকতায় যথেষ্ট পরিমানেই এই বিদ্রূপ রয়েছে। যেখানেই তিনি অসঙ্গতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখেছেন তাকে কটাক্ষবানে রঙ্গ-ব্যঙ্গে ভরিয়ে দিয়েছেন। তবে ঈশ্বর গুপ্তের রঙ্গ-ব্যঙ্গের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্যটি বঙ্কিমের ভাষাতেই বলা যেতে পারে :

> ''শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি। গৌরীশঙ্করকে গালি দেবার সময়ও রাগ করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগীষা—ব্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে হইবে এই জিদ। কবির লড়াই, ঐ রকম শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত ''কবির লড়াইয়ে'' শিক্ষিত—সে ধরণটা তাঁহার ছিল। অন্যত্র তাও না—কেবল আনন্দ। যে যেখানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা কানমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন —কারণ আর কিছুই নয়, দুইজনে একটু হাসিবার জন্য। কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর জেনারেল, লেপ্টেনান্ট গবর্ণর, কৌন্‌সিলের মেম্বার হইতে, মুটে মাঝি, উড়িয়া বেহেরা কেহ ছাড়া নাই। এক একটি চড় চাপড় এক একটি বজ্র—যে মারে, তাহার রাগ নাই, কিন্তু যে খায়, তার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার পাত্রাপাত্র বিচার নাই।''[৬]

এই গুণটির জন্যই ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যে তাঁর পূর্ববর্তী কবিয়ালদের থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্টিত।

এ কথা ঠিক যে ঈশ্বর গুপ্তের রঙ্গ রসিকতায় মাঝে মধ্যেই অশ্লীলতা এসে পড়েছে। এর কারণ সমকালীন যুগ প্রভাব :

> ''সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল।''[৭]

কবিয়ালদের সংস্পর্শে থেকে ঈশ্বরগুপ্ত কবিয়ালদের প্রভাব এড়াতে পারেননি। তাই কবিয়ালদের মতই তাঁর কবিতায় স্বাভাবিকভাবে এসে পড়েছে অনেক অশ্লীল শব্দ। দ্বিতীয় কারণটি ঈশ্বর

গুপ্তের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে নিহিত আছে। ব্যক্তিগত জীবনের নানা অতৃপ্তি ঈশ্বরগুপ্তকে জীবনের প্রতি ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। শৈশবে মাকে হারিয়ে এবং যৌবনে স্ত্রীকে হারিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত চূড়ান্তভাবে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এই হতাশা থেকে তৈরী হয়েছিল ক্ষোভ। তাঁর এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নানা অশ্লীল শব্দের মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমের মতে :

> ''ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে, সমাজকে, স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত যে ক্রোধ তাহা মিটিল না। জ্যেঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন। সেকেলে বাঙ্গালীর ক্রোধ কদর্য্যের উপর কদর্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধহয় ইহাদের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেব দ্বিজাদি প্রভৃতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র তাহারই ব্যাবহার্য—যে দুরাত্মা, তাহার জন্য এই কদর্য্য ভাষা। এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।''[৮]

ঈশ্বর গুপ্ত যে সময়ে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যের আসরকে রঙ্গ রসিকতায় ভরিয়ে তুলেছিলেন ঠিক সেই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন গদ্য শিল্পী **ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৭৮৭-১৮৪৮)। ঈশ্বর গুপ্তের মতই তাঁর সাহিত্যেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যঙ্গ কৌতুক। রঙ্গরস সৃজনে ভবানীচরণ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা আধুনিক ব্যঙ্গপ্রধান গদ্যের তিনিই প্রথম শিল্পী। ভবানীচরণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করলেও যে গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁকে অমরতা দিয়েছে সেই গ্রন্থগুলি হল 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫), 'নববিবিবিলাস' (১৮৩১) ও 'দূতীবিলাস'। এই চারটি গ্রন্থই হল রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক কৌতুক নক্‌শা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার অন্তর্জীবনের নানা ক্লেদকিন্ন রূপ, ব্যাভিচার, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নানা কুকীর্তি এই গ্রন্থগুলিতে ধরা পড়েছে। 'কলিকাতা কমলালয়' যথার্থ অর্থেই কলকাতা-দর্পণ হয়ে উঠেছে। 'নববাবুবিলাসে' ইন্দ্রিয় লোলুপ, কামাসক্ত উচ্ছৃঙ্খল বাবু সম্প্রদায়ের নানা কদাচারকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন ভবানীচরণ। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বাবুসম্প্রদায় কীভাবে তাস, পাশা, মদ, গাজা, ঘুড়ি ও কবুতর ওড়ানো, বুলবুলির লড়াই ও বাঈজী বারবণিতা সহযোগে জীবন নির্বাহ করতেন তারই ব্যঙ্গচিত্র 'নববাবুবিলাস'। 'নববিবিবিলাস' গ্রন্থে ভ্রষ্টাচারগ্রস্থ বাবুসমাজের দোষে বিবিদের অধঃপতনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আর 'দূতীবিলাস' গ্রন্থে রয়েছে ভ্রষ্ট চরিত্র নরনারীর কামাসক্তির বর্ণনা। তবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অপেক্ষা এ গ্রন্থে লেখকের আমোদপ্রিয় রসিক মন অধিক মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

ভবানীচরণের রচনাবলী পাঠ করলে দেখা যায় যে তাঁর সৃষ্ট হাস্যরস অধিকাংশ স্থলেই ব্যঙ্গরস মিশ্রিত। তবে সবসময় তাঁর সম্বন্ধে এ কথাটি সত্য নয়। অনেক সময়ই তাঁর আমোদপ্রিয় কৌতুকপ্রবণ মন খুবই সহজভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন 'দূতীবিলাস' গ্রন্থে হাস্যরসের খোঁচা একেবারে নেই। অজিতকুমার ঘোষ মন্তব্য করেছেন :

> ''নববাবুবিলাস', নববিবিবিলাস', ও 'কলিকাতা কমলালয়'-এ লেখকের বিদ্রূপধর্মিতাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু এই বিদ্রূপ নির্মম ও ক্ষমাহীন নহে, ইহার দাহ হাসির বাস্পকে একেবারে শুষ্ক করিয়া ফেলে নাই। সংস্কার ও শোধন লেখকের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু একথা তিনি ভুলিয়া যান নাই যে, তিনি মাষ্টার নহেন, শাসানো থেকে রসানোর দিকেই অধিক নজর দেওয়া তাঁহার ধর্ম।''[৯]

এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ছিলেন **প্যারীচাঁদ মিত্র** (১৮১৪-১৮৮৩)। সমাজের নৈতিক উন্নতি সাধন তাঁর সাহিত্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ের অধিকাংশ কবি সাহিত্যিকদের মত তাঁর প্রতিভাও ঝুঁকেছিল ব্যঙ্গের দিকে। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বাবুসম্প্রদায়ের নিন্দনীয় আচরণ, কৌলিন্য প্রথা, বহু বিবাহ, মদখাওয়ার ভয়াবহ পরিণাম, ধর্মের নামে ভন্ডামি ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তিনি। প্যারীচাঁদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আলালের ঘরে দুলাল' (১৮৫৮)। এ গ্রন্থটির মধ্য থেকে হাস্যরসিক প্যারীচাঁদকে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। এছাড়াও 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯) গ্রন্থটিতে প্যারীচাঁদের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আমরা পাই। 'আলালের ঘরে দুলাল'-এ রয়েছে বিভিন্ন ধরণের চরিত্রের উপস্থিতি। স্বার্থপর মাষ্টার থেকে শুরু করে, উচ্ছন্নে যাওয়া ধনীর সন্তান, স্বার্থপর, ধূর্ত, ফন্দিবাজ, দালাল প্রভৃতি চরিত্রকে টেকচাঁদ ঠাকুর অসাধারণ দক্ষতায় কৌতুকরস মিশ্রিত করে পাঠকের সামনে পরিবেশন করেছেন। 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' গ্রন্থটিতে মদ্যপানের শোচনীয় পরিনাম ও বৃদ্ধ সমাজপতিদের জাত রক্ষা করার নামে চরিত্রভ্রষ্টতার নানা দিককে সরসভাবে তুলে ধরা হয়েছে। হাস্যরসিক প্যারীচাঁদের যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন ড. অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা' গ্রন্থে :

> ''সমাজশোধন ও নীতিশিক্ষাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য, সেজন্য তাঁহার হাস্যরস অধিকাংশ স্থলে ব্যঙ্গধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। হাসির ছলে আঘাত এবং আনন্দরসের সহিত শিক্ষার কষ মিশাইয়া দেওয়া ব্যঙ্গকার লেখকের উদ্দেশ্য। লেখকের ব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে প্রধানত চরিত্রের দোষ ও অসঙ্গতি বর্ণনায়। তিনি সরস মন্তব্য, শ্লেষাত্মক উক্তি, বক্র কটাক্ষ এবং রসাল চিত্রণ-কৌশলের দ্বারা হাস্য উদ্রেক করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের হাসির মধ্যে লেখককে

পাইনা বলিয়া সেই হাসি দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়, গুরুমহাশয়ের গম্ভীর আনন দেখিয়া চঞ্চল শিশুর প্রগলভ্ হাসি ঠিক যেমনভাবে লুকাইয়া যায়।''[১০]

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্টপোষক ও শিল্পী ছিলেন **কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)**। তিনি ছিলেন বিচিত্র প্রতিভাধর ব্যক্তি। মহাভারতের অনুবাদসহ একাধিক গ্রন্থ তিনি রচনা করলেও তাঁর শ্রেষ্ট সৃষ্টি 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১ম খন্ড ১৮৬১, ২য় খন্ড ১৮৬২)। গ্রন্থটির নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে এটি একটি নক্সা জাতীয় রচনা। 'নক্সা' শব্দটি মূলত আরবি শব্দ থেকে এসেছে। বাংলায় সাধারণত নক্সাকে হাস্যরসাত্মক রচনা বলা হয়। এই হাসি যতটা কৌতুকের হাসি তার থেকেও অনেক বেশি বিদ্রূপপূর্ণ। এর প্রধান উদ্দেশ্যও ব্যঙ্গ। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে লেখক মানুষের ভন্ডামি, দুর্নীতি, অহমিকা, লোভ, স্বার্থপরতা ও নানা প্রকার চারিত্রিক অসঙ্গতিগুলিকে দূর করতে সচেষ্ট হন। ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধের মাঝামাঝি থেকে পণপ্রথা, পানদোষ, গণিকাবিলাস, বাবুসম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা, ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে নক্সা জাতীয় রচনা লেখা হতে থাকে। কালীপ্রসন্নর 'হুতোমপ্যাঁচার নক্সা' বাংলা সহিত্যের শ্রেষ্ঠ নক্সা। সমকালীন কলকাতার নানা অসঙ্গতি ও তার সংশোধনই ছিল 'হুতোম প্যাঁচার নক্সার' মূল উদ্দেশ্য। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচা' ছদ্মনামে কলকাতার নাগরিক সমাজের উচ্ছৃঙ্খল ও ভ্রষ্টাচারের নানা চিত্র বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। চড়ক, গাজন, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দুর্গোৎসব, মাহেশের মহারথ, প্রভৃতি নিয়ে বুজরুকি ও ধাপ্পাবাজীকে তিনি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। ধর্মের ভন্ডামির প্রতি তিনি ছিলেন সবথেকে বেশি খড়গহস্ত। তাঁর ভাষাও ছিল ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার জন্য উপযুক্ত ভাষা। এ ভাষা কলকাতার প্রচলিত মুখের ভাষা। কলকাতার চলতি বুলি বা ককনি ভাষায় তিনি যে নক্সা উড়িয়েছেন তা নিঃসন্দেহে সমসাময়িক কলকাতার নাগরিক হালচালের দর্পণ হয়ে উঠেছে। তাঁর ভাষারীতির একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

''দশটা বেজে গ্যাচে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেচে। মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁধে করে আফিমের দোকান ও গুলির আড্ডায় জমচেন। হেটো ব্যাপারীরা বাজারে ব্যাচা-কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। কলকাতা শহর বড়ই গুলজার। গাড়ির হড়রা, সহিসের পয়িস২ শব্দ, কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যান্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠচে-বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়।''[১১]

এরপর বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারায় উল্লেখযোগ্য নাম **দীনবন্ধু মিত্র** (১৮৩০-৭৩)। যদিও দীনবন্ধুর আগে মধুসূদন দত্ত তাঁর দুখানি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) রচনা করে হাস্যরসাত্মক রচনায় তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে ইংরেজী শিক্ষিত ভ্রষ্টাচার তরুণ যুবকদের উদ্ভট আচরণকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের কুচরিত্র লাম্পট্য ও ধর্মের নামে ভন্ডামিকে কশাঘাত করা হয়েছে। দুটোই প্রহসন হিসেবে অপূর্ব সৃষ্টি। দুটো প্রহসনেরই লক্ষ্য তৎকালীন সমাজমানস ও ব্যক্তিমানসের কদর্য চরিত্র ও নীতিভ্রষ্টতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কৌতুকের মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরা। এ কাজে মধুসূদন বেশ ভালোভাবেই সফল হয়েছিলেন তা বলাই যায়। আর দীনবন্ধুর প্রতিভাকে তো অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেইছেন 'শ্রেষ্ঠ কমেডি লেখকের প্রতিভা'। দীনবন্ধুর হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা এক নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। তিনিই প্রথম ব্যঙ্গধর্মী শিল্পী যিনি হাস্যরসের ধারাকে হিউমার রসাত্মক করে তুলেছিলেন। এর আগে হাসি ও কান্না ছিল দুই বিপরীত মেরুর বস্তু। কিন্তু দীনবন্ধুই প্রথম এই দুই বিপরীত রসের সহাবস্থান ঘটালেন। তাঁর এক-একখানি নাটক যেন উন্মুক্ত হাস্যরসের প্রস্রবণ। জীবনের নানা অসঙ্গতি, সমাজের নানা দুর্নীতি থেকে দীনবন্ধু তাঁর হাস্যরসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। দীনবন্ধুর নাটকের সংখ্যা মোট সাতটি। এর মধ্যে 'নীলদর্পণ' ছাড়া বাকি ছটি নাটকই হাস্যরসাত্মক। এমনকি নীলদর্পণের মত করুণরসাত্মক নাটকেও দীনবন্ধু হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। তাঁর প্রথম কমেডি 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬০)। এই নাটকের জলধর চরিত্রটি হাস্যরসাত্মক চরিত্র হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর রচিত 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) ও 'জামাই বারিক' (১৮৭২) প্রহসনদুটিতে তৎকালীন কলকাতার দুটি বাস্তব চিত্র ও সমস্যাকে হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। 'বিয়েপাগলা বুড়ো' প্রহসনে রয়েছে বিবাহবাতিকগ্রস্থ এক বৃদ্ধের নকল বিয়ের আয়োজন করে তাকে নাজেহাল করার কাহিনি, আর 'জামাই বারিক' প্রহসনে রয়েছে ধনী পরিবারের ঘরজামাই পোষার প্রথাকে হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ। তবে দীনবন্ধুর প্রহসনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬)। দীনবন্ধুর হাস্যরসাত্মক প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব মূলত এই নাটকটির জন্যই। ব্যঙ্গের সঙ্গে করুণরসের মিশ্রণে কীভাবে শ্রেষ্ঠ হাস্যরস তৈরী হয় বাংলা সাহিত্যে তার প্রথম দৃষ্টান্ত বলা যায় এই প্রহসনটিকে। এর আগে ঈশ্বর গুপ্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তার প্রধান উপাদান ছিল ব্যঙ্গ। তাঁরা বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের নিয়ে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছেন, প্রয়োজনে শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু সেই চরিত্রগুলির

সঙ্গে কখনোই একাত্মতা অনুভব করেননি। কিন্তু দীনবন্ধুই সর্বপ্রথম সেই চরিত্রগুলির অন্তরবেদনাকে আপন অন্তরে অনুভব করেছেন। শুধু তাদের আঘাত দিয়ে কৌতুক অনুভব করেননি, তাদেরকে ভালোবেসে চোখের জলও ফেলেছেন। 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ এই ধরনের করুণ হাস্যরসের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। নিমচাঁদ সে যুগের প্রতীকী চরিত্র। নিমচাঁদ উচ্চ শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য আদর্শ সম্পর্কে সচেতন। এহেন একটি চরিত্র মদের নেশায় সর্বনাশের গভীরে তলিয়ে গেছে। নিজের এই অধঃপতন সম্পর্কে সে পূর্ণমাত্রায় সচেতন বলেই মাঝেমধ্যেই সে গভীর হতাশায় ডুবে গেছে। তাই গভীর আক্ষেপের সুরে সে বলেছে : ''হা জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ করেছি, আমাকে অধর্মাকর মদিরা হস্তে নিপাতিত করলে?'' নিমচাঁদের এই আক্ষেপ আমাদেরকেও ভীষণভাবে ব্যথিত করে এবং হাসিকেও বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) বাংলা সাহিত্যে যে নতুন ধরনের হাস্যরসের সূচনা করেছিলেন তাকেই পরিপুষ্ট করেছেন **বঙ্কিমচন্দ্র** (১৮৩৮-১৮৯৪)। ব্যক্তিজীবনে দীনবন্ধুর মত মিশুকে না হলেও লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য ভাবরসে পরিপুষ্ট একজন আধুনিক মানুষ। তিনি এই আধুনিক দৃষ্টি নিয়েই সমাজকে দেখেছেন। আর যখনই সেই দৃষ্টি বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছে তখনই তাকে বিদ্ধ করেছেন ব্যঙ্গবাণে। এই আধুনিক দৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী লেখকদের ছিল না তা নয় কিন্তু বঙ্কিম যেভাবে দেশ সমাজ ব্যক্তি ও জীবনের নানা জিজ্ঞাসা ও সমস্যার গভীরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন তা তারা পারেননি। আসলে বঙ্কিম চেয়েছিলেন দেশী ও বিদেশী ভাবধারা সমন্বয়ের মাধ্যমে এক কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। এই লক্ষ্যই তাকে নির্মম ও নিষ্ঠুর হতে দেয়নি। তাই সমাজের সমস্তরকম অসঙ্গতিকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন বটে কিন্তু ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপই তাঁর কাছে একমাত্র সত্য হয়ে থাকেনি। মাঝে মাঝে ব্যঙ্গের শরগুলি অতি দৃঢ় ও বিষাক্ত হয়েছে বটে কিন্তু প্রতিটিতেই মিশিয়ে দিয়েছেন অশ্রুর আভাস। আর এই অশ্রুর আভাসই বঙ্কিমকে নির্ভেজাল হিউমারিষ্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ও প্রহসনগুলি এ ধরণের হাস্যরসের প্রস্তাবনা হলেও বঙ্কিমই প্রথম সার্থকভাবে ও ব্যাপক আকারে এ ধরনের হাস্যরস সৃষ্টি করতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই নির্দ্বিধায় বলেছেন : ''নির্মম, শুভ্র, সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথম বঙ্গ সাহিত্যে আমদানি করেন।''[১২] শুধু তাই নয় বঙ্কিমই সর্বপ্রথম হাস্যরসকে অশ্লীলতা থেকে মুক্ত করে একটি শোভনীয় রূপ দিতে পেরেছিলেন এবং গভীর জীবনদর্শন প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

হাস্যরসিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিতি সব থেকে বেশী করে চোখে পড়ে তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলিতে। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলি হল ‘লোকরহস্য’ (১৮৭৪), ‘বিজ্ঞানরহস্য’ (১৮৭৫), ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ (১৮৭৫), ‘বিবিধ সমালোচনা’ (১৮৭৬), ‘সাম্য’ (১৮৭৯), ‘প্রবন্ধ পুস্তক’ (১৮৭৯), ‘মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত’ (১৮৮০), ‘কৃষ্ণচরিত্র’ (১৮৮৬), ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ (১ম-১৮৮৭, ২য়-১৮৯২), ‘ধর্মতত্ত্ব’ (১৮৮৮), ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ (১২৯৩বঙ্গাব্দ)। এই প্রবন্ধগ্রন্থগুলির মধ্যে ‘লোকরহস্য’, ‘মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত’ ও ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ ব্যঙ্গাত্মক ও সরস প্রবন্ধ হিসেবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, ধর্মনীতি, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে সরসভাবে আলোচনা করেছেন এই তিনটি প্রবন্ধে। ‘লোকরহস্যে’র বেশিরভাগ প্রবন্ধগুলি হাস্যরসাত্মক ভঙ্গীতে রচিত। এখানে কৌতুকরসের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম জাতীয় জীবনের নানা ত্রুটিগুলিকে সমালোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধগ্রন্থের ‘ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল’ রচনায় বানরের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর অন্তঃসারশূন্যতা, ‘বাবু’ প্রবন্ধে ভারতবাসীর পরানুচিকির্ষতা, ‘গর্দভ’ প্রবন্ধে উচ্চাসনে আসীন মানুষদের নির্বোধ আচরণ, ‘রামায়নের সমালোচনা’ প্রবন্ধে ইংরেজ সমালোচকদের অযথা জ্ঞানের আস্ফালন এবং ‘হনুমদ্বাবু সংবাদে’ হঠাৎ গজিয়ে ওঠা নব্যবাবুসম্প্রদায়কে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছেন বঙ্কিম।

‘কমলাকান্তের দপ্তরে’ কমলাকান্তের ছদ্মবেশে বঙ্কিম ভারতবাসীর নানা অসঙ্গতিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত কৌতুককরভাবে। হাসির অন্তরালে এক প্রকৃত জীবন সত্যের সন্ধান দেওয়াই এখানে বঙ্কিমের লক্ষ্য। ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে’র সম্পাদকদ্বয় শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাসের উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য :

> ‘‘বাঙ্গালী জাতীর পরাধীনতার সুগভীর ধিক্কার এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নিদারুণ তীব্রতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাতৃ পূজার মন্ত্র শিখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম আমাদের জাতীয়তাবোধের জাগ্রত করিয়া আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন এই ‘কমলাকান্তে’। আধুনিক বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে কমলাকান্ত হইতেই আমাদের যাত্রা শুরু।’’[১৩]

কমলাকান্ত নেশাখোর কিন্তু নির্বোধ নয়। নেশার ঝোঁকে কমলাকান্ত কল্পনার রাজ্যে গা ভাসান ঠিকই কিন্তু কখনোই তার সংলাপ নির্বোধ মাতালের সংলাপ হয়ে ওঠেনি। প্রবল যুক্তিবাদ ও চিন্তাশীলতা সেই সংলাপকে করেছে ক্ষুরধার। কমলাকান্তের হাস্যকর আচরণ ও সংলাপ আমাদেরকে হাসায় বটে কিন্তু সে হাসির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে জীবনের তীক্ষ্ণ ও মৌলিক বিশ্লেষণ। ‘সাহিত্যের বাজার’, ‘মনুষ্যফল’, ‘পতঙ্গ’, ‘বিড়াল’, ‘ফুলের বিবাহ’, ‘ঢেকি’ ইত্যাদি প্রবন্ধে ভারতবাসীর চারিত্রিক অসঙ্গতির অন্তঃসারশূন্যতাকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

'মনুষ্যফল' প্রবন্ধে ধনীদের কাঁঠাল, স্ত্রী লোকেদের নারিকেল, বিলাতী সিভিলিয়ানদেরে আম্র, দেশহিতৈষীদের শিমুল ফুল, ব্রাম্মণ পন্ডিতদের ধুতুরাফুল, বাঙ্গালী লেখকদের তেঁতুল ও দেশী হাকিমদের কুষ্মান্ড বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। সমাজের ধনী ও দরিদ্রের সামাজিক বৈষম্য বঙ্কিমের চোখ এড়ায়নি। গভীর সমাজবীক্ষণের ফলে বঙ্কিম বুঝেছিলেন যে চোর সমাজেরই সৃষ্টি। বিড়ালের উক্তিতে সে কথা তিনি আমাদের শুনিয়েছেন :

> ''আর, আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে, জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, 'মেও! মেও! খাইতে পাই না!—আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব।...চোরের দন্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দন্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দন্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দন্ড নাই কেন?''[১৪ক]

এভাবে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র প্রবন্ধগুলিতে হাস্যরসের আড়ালে সমাজতাত্ত্বিক বঙ্কিম আত্মপ্রকাশ করেছে। কোন ব্যক্তিবিশেষ নয় সমাজ ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতিই এখানে বঙ্কিমের আশ্রয়স্থল। প্রবন্ধগুলির অন্দরমহলে কৌতুকরসের ছড়াছড়ি কিন্তু সে কৌতুক কোথাও জ্বালাময়ী রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি বরং এক ধরণের স্নিগ্ধসজল রসস্রোতের মূর্চ্ছনায় তা বেদনাসিক্ত হয়ে উঠেছে। 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' প্রবন্ধে কোনরকম যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও শুধু খোশামোদের জোরে উচ্চ পদে আসীন অপদার্থ রাজ কর্মচারীদের বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছেন তিনি। মুচিরাম দীনবন্ধু মিত্রের ঘটিরামেরই ('সধবার একাদশী' নাটকের চরিত্র) সগোত্রীয়।

উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি ছাড়া উপন্যাসের মধ্যেও হাস্যরসিক বঙ্কিমের উপস্থিতি চোখে পড়ে। তবে তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে হাস্যরসের যে গভীরতা লক্ষ করা যায় উপন্যাসের মধ্যে সে গভীরতা নেই। এ প্রসঙ্গে অজিতকুমার ঘোষ জানিয়েছেন :

> ''বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলীতে যে হাস্যরসের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা খুবই সূক্ষ্ম, জটিল ও মিশ্রিত; তাহা কোথাও লেখকের টীকা টীপ্পনি এবং কোথাও বা ঘটনা চরিত্র অথবা সংলাপের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।''[১৪খ]

'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'দেবীচৌধুরাণী' প্রভৃতি উপন্যসে ঘটনা বিকাশের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে হাস্যকর উক্তি প্রত্যুক্তি লক্ষ্য করা যায়। আর উল্লেখ করার মত হাস্যকর চরিত্র বঙ্কিম সেভাবে সৃষ্টি করেননি। তবু রজনীর হীরালাল অথবা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কৃষ্ণকান্ত সরস চরিত্র হিসেবে কিছুটা আদরনীয়।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা হিসেবে যেমন আমরা স্মরণ করি বঙ্কিমকে তেমনি বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক স্রষ্টা হিসেবে আমরা স্মরণ করি **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (১৮৬১-১৯৪১)**।রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই প্রথম বাংলা ছোটগল্পের জন্ম। এর আগে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২২) 'মধুমতী' (১৮৭৩) ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯) 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' আর 'দামিনী' (১৮৭৪) নামে যে গল্পগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলিকে বাংলা ছোটগল্পের ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করা চলে। আর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের থেকে বয়সে বড় হলেও (ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আর রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে) সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর আগমন রবীন্দ্রনাথের অনেক পরে। কেননা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। ততদিনে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হয়ে গেছে। আর রবীন্দ্রনাথ এমন একজন শিল্পী যিনি সমস্ত রকম রসের কারবারি। তাই তাঁর ছোটগল্পে অন্যান্য রসের সঙ্গে হাস্যরসেরও প্রতিফলন ঘটেছে। শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী তাই যথার্থই বলেছেন :

> ''আমার তো গল্পগুচ্ছের প্রধান নরনারী এমন একটিও চোখে পড়ে না, যাহার চরিত্রে স্মিত রসের কিছু মিশেল ঘটে নাই; তবে সে পদার্থ কোথাও স্বচ্ছ, কোথাও অস্বচ্ছ, কোথাও লঘু, কোথাও ঘনীভূত।''[১৫]

কৌতুকরসকে তো জীবনরসের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বৃদ্ধবয়সেও হাস্যরসের প্রতি ছিল তাঁর সমান অধিকার। তাই 'প্রহাসিনী'র (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) ভূমিকায় তিনি সরসভাবেই বলেছেন :

''আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু,
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু-
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।...
এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি
হাসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাব্‌লামি।
এ নিয়ে প্রবীণ যদি করে রাগারাগি
বিধাতার সাথে তারে করি ভাগাভাগি

হাসিতে হাসিতে লব মানি।''[১৬]

রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় হাস্যরসিক তা তাঁর 'ছিন্নপত্র' (১৯১২) পড়লেই বোঝা যায়। শুধু ব্যক্তিজীবনে নয় সাহিত্যে হাস্যরস সৃষ্টির বিষয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। 'ছিন্নপত্রাবলী'র ৪৭ সংখ্যক পত্রে এই হাস্যরসের ব্যবহার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> ''হাস্যরস প্রাচীন কালের ব্রম্মাস্ত্রের মতো, যে ওর প্রয়োগ জানে সে ওকে নিয়ে একবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতে পারে—আর যে হতভাগ্য ছুঁড়তে জানে না, অথচ নাড়তে যায়, তার বেলায় হাস্যজনক তাকেই করে তোলে।''[১৭]

'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধে কৌতুকহাস্যের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে তিনি কৌতুকহাস্যের কারণ সম্বন্ধে বলেছেন : ''...অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়...।''[১৮] অসঙ্গতি নানারকমের হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই নানা ধরণের অসঙ্গতির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন 'ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসঙ্গতি, কথার সহিত কার্যের অসঙ্গতি ইত্যাদি। এই অসঙ্গতি ট্রাজেডি ও কমেডি উভয়েরই বিষয়। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : ''অসঙ্গতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।''[১৯] রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য ধারা অনুসরণ করলে কৌতুকহাস্য সৃষ্টিতে তাঁর প্রতিভার দিকটি পাঠকের বিশেষভাবে নজড় কাড়ে। 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭), 'ব্যঙ্গকৌতুক'(১৯০৭), 'চিরকুমার সভা'(১৯২৬) ইত্যাদি নাটক ও প্রহসনে রবীন্দ্রনাথ মূলত হাস্যরসিক। 'শেষ- রক্ষা' (পূর্ব নাম 'গোড়ায় গলদ'), 'চিরকুমার সভা' (পূর্ব নাম 'প্রজাপতির নির্বন্ধ') নাটক দুটিতে কৌতুকময়তা ও ব্যঙ্গরসের মিশ্রণে হাস্যরসের অনাবিল স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। নাটক এবং প্রহসনে হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথকে বেশী করে চোখে পড়লেও তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পেও কৌতুকহাস্যের এক অনাবিল স্রোত চোখে পড়ে। সংখ্যায় কম হলেও বাংলা ছোটগল্পে তিনিই প্রথম হাস্যরসের গল্পে লেখেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বাংলা হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের ধারায় তিনিই প্রথম শিল্পী। 'ইচ্ছাপূরণ', 'মুক্তির উপায়', 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'সমাপ্তি', 'অধ্যাপক', 'সে', 'গল্পসল্প', 'রাজটিকা' ইত্যাদি গল্পগুলিকে কৌতুকরসের গল্প হিসেবে অভিহিত করা চলে। এর মধ্যে একমাত্র 'মুক্তির উপায়' গল্পটিকে বাদ দিলে বাকি গল্পগুলিতে মূলরস কিন্তু কৌতুকরস নয়।

'মুক্তির উপায়' গল্পে মূল রস যে হাস্যরস একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই গল্পে যে কৌতুকরস ব্যবহৃত তা নির্মল ও মার্জিত। ফকিরচাঁদ নামে আপাত গম্ভীর একটি যুবক কীভাবে বিচিত্র ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়ে মুক্তির জন্য ছটফট করেছে তারই কৌতুক রসাত্মক কাহিনি এই গল্পটি। এর মধ্যে কোথাও কোন স্থূল ভাঁড়ামি নেই, জীবনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে। 'গল্পসল্প'তে নানান বিচিত্র চরিত্র সন্নিবেশিত হয়ে হাস্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ছেলেমানুষি কান্ডকারখানা যে কতটা হাস্যকর তা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন এখানে। নাতনি কুসুমীকে দাদামহাশয় পুরাতন দিনের নানা কৌতুককর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। এই কৌতুককর অভিজ্ঞতাগুলি পাঠককেও সমান আনন্দ দেয়। তবে নিছক কৌতুকই এ গল্পের একমাত্র কথা নয় হাসির অন্তরালে অনেক গূঢ় তত্ত্বের সমাবেশ হয়েছে এখানে। সরোজকুমার বসু এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন :

> ''রস রচনা হিসাবে 'গল্পসল্প' আবোল তাবোল শ্রেণীভুক্ত হলেও তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কৌতুকরসের অন্তরালে এখানে স্থানে স্থানে গভীর ভাব ইঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিছক হাস্যকর কবিতা এবং কৌতুককর চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে এখানে অন্যান্য ধরনের কবিতা ও গল্পেরও সমাবেশ হয়েছে। এবং সেগুলির অন্তরালে নানা serious চরিত্র, নানা গভীর তত্ত্ব এসে দাঁড়িয়েছে।... রূপক কাহিনীর অন্তরালে ভাবের গভীরতা প্রকাশই এগুলির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।''[২০]

'সে' গল্পগ্রন্থ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। শিশু মনের উপযোগী করে কৌতুকর গল্প এখানে সন্নিবেশিত হলেও আজগুবির সঙ্গে গূঢ় তত্ত্ব এখানে মিশ্রিত হয়েছে। শেয়ালের গল্প, বাঘের গল্প অথবা গেছোবাবার গল্প যাইহোক না কেন সবেতেই রয়েছে একধরণের ব্যঙ্গ। যেমন একটি সংলাপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> ''দাদা মশায়, বাঘেরা তা হলে খুব ধার্মিক?
>
> ধার্মিক না হলে কি এত নিয়ম বাঁচিয়ে চলে। সেই জন্যই তো শেয়ালরা ওদের ভারি ভক্তি করে। বাঘের এঁটো প্রসাদ পেলে ওরা বর্তিয়ে যায়। মাঘের ত্রয়োদশীতে যদি মঙ্গলবার পড়ে তা হলে সেদিন ভোরে রাত্তিরে ঠিক দেড় প্রহর থাকতে বুড়ো বাঘের পা চেটে আসা শেয়ালের ভারি পুণ্যকর্ম। যত শেয়াল প্রাণ দিয়েছে এই পুণ্যের জন্যে।''[২১]

'অধ্যাপক' গল্পে গল্পের নায়ক মহীন্দ্রনাথের বিদ্যার মিথ্যা অহমিকা চূর্ণ হয়েছে অত্যন্ত কৌতুককরভাবে। নিজের পান্ডিত্য সম্পর্কে গল্পের নায়কের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাদের একটি তর্কসভা ছিল। সে নিজেই ছিল সেই সভার বিক্রমাদিত্য এবং নবরত্ন। প্রথমবার তার

অহমিকাকে মিথ্যা প্রমান করল তাদেরই কলেজের নবনিযুক্ত অধ্যাপক বামাচরণবাবু। কার্লাইলের সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ লিখে তিনি যখন আত্মশ্লাঘা অনুভব করছিলেন তখন সে প্রবন্ধ আদ্যোপান্ত শুনে বামাচরনবাবু শান্ত গম্ভীর স্বরে বুঝিয়ে দিলেন যে আমেরিকার সুবিখ্যাত লেখক লাউয়েল সাহেবের প্রবন্ধ থেকে তার প্রবন্ধটির যে অংশ চুরি করা হয়েছে সে অংশ অতি চমৎকার এবং যে অংশ তার নিজের লেখা সেটুকু পরিত্যাগ করলেই ভালো হত। দ্বিতীয়বার তার অহমিকা চূর্ণ করল কিরণবালা যাকে প্রথমবার দেখা মাত্রই সে তার প্রেমে গা ভসিয়েছিল। শান্ত লাজুক স্বভাবের কিরণবালার কাছে নিজের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যেই পান্ডিত্য জাহির করেছিল সে। কিরণবালার হাতে শেলির কবিতা দেখে তার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত :

> ''আমি কিয়দ্দূরে একটা ধাপ নীচে বসিয়া ইংরাজি কাব্য সাহিত্যের কথা উত্থাপন করিলাম, এমন করিয়া কথা তুলিলাম যাহাতে কিরণেরও সাহিত্য শিক্ষা হয় এবং আমারও মনের কথা ইংরাজ কবির জবানিতে ব্যক্ত হইয়া উঠে।''[২২]

গল্পের নায়কের এই অহংকার অচিরেই মিথ্যা প্রমান হল। গল্পের নায়কের কথায় :

> ''পরদিন সকালের ডাকে লাল পেন্সিলের দাগ-দেওয়া একখানা স্টেট্স্ম্যান কাগজ পাওয়া গেল, তাহাতে বি.এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। প্রথমেই প্রথম-ডিভিশান কোঠায় কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া একটা নাম চোখে পড়িল; আমার নিজের নাম প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কোন বিভাগেই নাই।''[২৩]

আত্মঅহমিকায় পরিপূর্ণ গল্পের নায়ককে এরকমভাবে জব্দ করে রবীন্দ্রনাথ গল্পের মধ্যে কৌতুকরস জমিয়ে তুলেছেন।

প্রায় একইরকমভাবে কৌতুক সৃষ্টি হয়েছে 'দর্পহরণ' গল্পে। গল্পের নায়ক স্ত্রীর দর্পহরণ করতে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প লেখার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। দুজনের গল্পই বৈশাখের 'উদ্দীপনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। গল্প লেখা সমাপ্ত করবার পর নায়কের মনে হয়েছে : ''ভাবিলাম বেচারা, নির্ঝর, ইংরেজি সাহিত্য পড়ে নাই, তাহার ভাব সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্র সংকীর্ণ; আমার সঙ্গে তাহার এই লড়াই নিতান্ত অসমকক্ষের লড়াই।''[২৪] কিন্তু গল্প প্রকাশের পর দেখা গেল সে নয় তার স্ত্রী নির্ঝরিনী দেবীই পুরুস্কৃত হয়েছে। গল্পের এই পরিণতি নিঃসন্দেহে কৌতুককর। তবে হাস্যরসকে মূল অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখতে চাননি। তাই সেভাবে হাস্যরসের অনাবিল স্রোত তাঁর গল্পে আমরা পাই না। ত্রৈলোক্যনাথ অথবা পরশুরাম যেভাবে তাঁদের গল্পে হাস্যরসের ফোয়ারা সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথের গল্পে সে হাস্যরসের ফোয়ারা সৃষ্টি হয়নি। প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের গল্পে সৃষ্ট হাস্যরসকে তাই স্মিত

হাস্যরস বলতে চেয়েছেন। এই হাস্যরস একই সঙ্গে দেহ ও মনের হাসি নয়। এ হাস্যরস শুধুমাত্র মনের হাসি। রবীন্দ্রনাথের বহু ছোটগল্পে এই ধরণের হাস্যরসের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। শুধুমাত্র ছোটগল্পে নয় প্রায় সব শ্রেণীর রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ স্মিত হাস্যরসকে একটি উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন আর তার ফলেই নিতান্ত দুরূহ বিষয়ও আশ্চর্য প্রসন্নতা লাভ করেছে। তাঁর গল্পের হাস্যরসের মূল্যায়ন করতে গিয়ে অজিতকুমার ঘোষ যে মন্তব্য করেছেন তাই তাঁর হাস্যরসাত্মক গল্পের যথার্থ মূল্যায়ন :

> ''গল্পগুলির হাস্যরস প্রবাহমান বাতাসের মত, বিকীর্ণ ফুলের গন্ধের মত মনকে পুলকিত করে কিন্তু যেন ধরা দিতে চায় না। কোথাও একটু তির্যক দৃষ্টি, কোথাও বা রসাল দুই একটি রঙের আঁচড়, আবার কোথাও হয়তো হঠাৎ আলোকিত কোন ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি হাস্য কৌতুকের অবিরাম স্নিগ্ধ স্পর্শের দ্বারা গল্পগুলিকে অশেষ প্রীতিপদ করিয়া তুলিয়াছে।''[২৫]

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এলেন **প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়** (১৮৭৩-১৯৩২)। বাংলা হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের ধারায় তিনি একজন প্রধান শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যেখানে ডুব দিয়েছে হৃদয় রহস্যের গভীরে সেখানে প্রভাতকুমার জীবনের উপরিতলের ছোট ছোট সুখ-দুঃখকেই তাঁর গল্পের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন। বাঙ্গালীর হাশিখুশিতে উচ্ছল জীবনের অনতিগভীর দিক তাকে সর্বদাই আকর্ষণ করত। আর তারই শিল্পসম্মত প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কথাসাহিত্যে বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর ছোটগল্পগুলি পড়ে মন্তব্য করেছেন :

> ''তোমার গল্পগুলি ভারি ভালো। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; কোথাও যে কিছুমাত্র ভার বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।''[২৬]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রভাতকুমারের গল্পগুলি পড়ে প্রায় অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন। তিনি বলেছেন :

> ''আমাদের জীবনে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের কম্পন লাগে, যে ছোটখাটো সমস্যার স্পর্শে ইহা হিল্লোলিত হয়, আশা ও কল্পনা, উচ্চাভিলাষ ও কর্মশক্তি যে ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা জাগাইয়া তোলে, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে বৈষম্য হাস্যরসের সৃষ্টি করে— তাহার সমস্ত বুদ্‌বুদ্‌ ও উত্তেজনা ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালায় বেশ স্বচ্ছন্দে ও সুশোভনভাবে ধরিয়া রাখা যায়। এই ছোটগল্পের আর্টে প্রভাতকুমারের স্বাভাবিক নিপুণতা বিস্ময়কর।''[২৭]

শুধু তাই নয় প্রভাতকুমারের গল্পগুলিকে তাঁর মনে হয়েছিল ‘বয়স্কদের রূপকথার রাজ্য’। সত্যিই রূপকথার জগতের মতোই এক সহজ সরল সমস্যামুক্ত জীবনের চিত্র তাঁর গল্পগুলিতে আমরা পাই। আর শিশিরকুমার দাশ মন্তব্য করেছেন :

> ‘‘তাঁর বিশাল ব্যাপ্ত গল্পলোকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, সবচেয়ে বড়গুণ রমনীয়তা। কালিদাস গ্রীস্মের বর্ণনায় বলেছেন যে দিবসগুলির পরিণাম বড়ই রমণীয়। প্রভাতকুমারের গল্পগুলি সম্পর্কেও পরিণাম রমনীয়তার কথা বলা চলে। তাঁর যে গল্প নিষ্ঠুর বা করুণ, সাধারণত সে গল্পও শেষ পর্যন্ত মধুর! তাঁর সাহিত্যে তাই ‘ট্র্যাজেডি’ বা কোনো গভীর বেদনা ও দুঃখ নেই।’’[২৮]

প্রভাতকুমারের প্রথম প্রকাশিত গল্প ‘একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবন চরিত’। ১৮৯৬ (ভাদ্র ১৩০৩) বঙ্গাব্দে ‘দাসী’ পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। তাঁর গল্প সংকলনগুলি হল ‘নবকথা’ (১৮৯৯), ‘ষোড়শী’ (১৯০৬), ‘দেশী ও বিলাতী’ (১৯০৯), ‘গল্পাঞ্জলি’ (১৯১৩), ‘গল্পবীথি’ (১৯১৬), ‘পত্রপুস্প’ (১৯১৭), ‘গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প’ (১৯২১), ‘হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প’ (১৯২৪), ‘বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প’ (১৯২৬) ‘যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প’ (১৯২৮), ‘নূতন বৌ ও অন্যান্য গল্প’ (১৯২৯), ‘জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প’ (১৯৩১) প্রভৃতি। প্রভাতকুমারের গল্পগুলি পড়লেই বেশ বোঝা যায় যে তাঁর গল্পের একটি প্রধান স্থান জুড়ে রয়েছে কৌতুকরস। শুধু কৌতুক নয় জীবনের হাসিকান্নার হীরাপান্নাকে একই সঙ্গে তাঁর গল্পে আমরা পরিস্ফুট হতে দেখি। জীবনের কান্নাহাসির দোলদোলানো পৌষ ফাগুনের পালা তাঁর গল্পে আমরা অভিনীত হতে দেখি। একদিকে হাস্যকৌতুক অন্যদিকে গভীর করুণরস তাঁর গল্পগুলিতে রয়েছে। ‘ফুলের মূল্য’, ‘মাতৃহীন’, ‘আদরিণী’, ‘কাশীবাসিনী’ ইত্যাদি গল্পগুলি তার প্রমাণ।

প্রভাতকুমারের অধিকাংশ গল্পে রয়েছে নির্ভেজাল আনন্দ। গল্প পড়া শেষ করে পাঠক তাঁর গল্পগুলি থেকে একধরণের রমণীয় পরিণাম লাভ করে। যেমন ‘রসময়ীর রসিকতা’ গল্পটি। একপত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পুরুষের দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহের ইচ্ছাকে এ গল্পে উপহাস করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ভূতের ভয় এবং ভূত-প্রেত বিশ্বাসীদের প্রতি রয়েছে লঘু কৌতুকের বক্রহাসি। রসময়ীর স্বামী ক্ষেত্রমোহন। তাঁর বয়স চল্লিশ বৎসর। তাঁর দ্বিতীয়বার বিবাহ করার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও রসময়ীর কৌশলে তা সম্ভব হয় না। হঠাৎ করেই রসময়ীর অকাল মৃত্যু ক্ষেত্রমোহনের দ্বিতীয়বার বিবাহের দ্বার খুলে দেয়। ক্ষেত্রমোহন এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চায়। এবারেও বাদ সাধে রসময়ী। দ্বিতীয়বার বিবাহের আয়োজন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রমোহনকে শাসিয়ে রসময়ীর চিঠি আসে, বিয়ে করলে ললাটে অশেষ দুর্গতি লেখা আছে।

রসময়ি মৃত অথচ তাঁর চিঠি। এই ভৌতিক ব্যাপার নিয়ে শোরগোল পড়ে। অবশেষে সমাধান হল রহস্যের। জানা গেল যে চিঠিগুলি সব রসময়ীরই লেখা। তিনি জীবদ্দশায় স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের অনুমান করে এইসব ভৌতিক চিঠিগুলি লিখে গিয়েছিলেন। তার ঘনিষ্ঠ একজন রমণীই ওই চিঠিগুলি এক এক করে ক্ষেত্রমোহনকে পাঠিয়েছেন। হাসির হিল্লোলে এভাবেই এ গল্পের সমাপ্তি ঘটলো।

প্রভাতকুমারের কিছু কিছু গল্পে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে ঘটনাগত অসঙ্গতির সঙ্গে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের অসঙ্গতির সূক্ষ্ম রসায়নের সূত্রে। যেমন 'বলবান জামাতা' গল্পটি। জামাতার নাম নলিনীকান্ত। তাঁর দেহ রমণীর মতই নরম প্রকৃতির। তাই নিয়ে শ্যালিকারা হাসিঠাট্টা করলে মনে মনে এর প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরী হন তিনি। রীতিমত ব্যায়াম করে পালোয়ানের মত শরীর বানিয়ে বন্দুক হাতে শ্বশুরবাড়িতে যাত্রা করলেন তিনি। যাত্রার আগে অবশ্য শ্বশুরবাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠালেন। কিন্তু যথাসময়ে শ্বশুর বাড়িতে টেলিগ্রাম এসে না পৌঁছানোতে শ্বশুরবাড়ির কেউ তার আসার খবর জানতে পারলো না। এদিকে তিনি তো এসে উপস্থিত। শ্বশুরবাড়ির কেউ তার এই নতুন চেহারার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে তার কপালে জুটলো শুধুই লাঞ্ছনা। তাকে ডাকাত ভেবে নিল সবাই। অবশ্য গল্পের শেষে সকল ভ্রান্তির অবসান ঘটলো।

চরিত্রগত অসঙ্গতি যে হাস্যরসের প্রাণ হয়ে ওঠে তার দৃষ্টান্ত প্রভাতকুমারের বহু গল্পেই পাওয়া যায়। 'বিবাহের বিজ্ঞাপন', 'প্রতিজ্ঞাপূরণ' প্রভৃতি গল্প এর দৃষ্টান্ত। 'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পের নায়ক রাম অবতার সিদ্ধিপানে অভ্যস্ত। একদিন নেশার ঝোঁকে কাগজে একটি বিবাহের বিজ্ঞাপন তার চোখে পড়লো। কাগজটি যে পুরাতন সে খেয়াল তার ছিল না। বিজ্ঞাপনের ঠিকানা অনুযায়ী সে চিঠি লিখলো। যাদের হাতে সেই চিঠি পৌঁছালো তারা কাশীর প্রসিদ্ধ গুন্ডা। অল্পদিনের মধ্যেই পাত্রী দেখার সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে সে কাশী অভিমুখে যাত্রা করলো। সেখানে যাওয়ার পর গুন্ডারা তাকে নাস্তানাবুদ করে একেবারে উলঙ্গ করে ছেড়ে দিল। দিনকয়েক পরে সকলে শুনলো যে রাম অবতার সংসার বিবাগী হয়ে কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। প্রভাতকুমারের গল্পের পরিণাম রমণীয়। তাই মাতুলের চেষ্টায় সর্বস্বহারানো রাম অবতার নিজগৃহে ফিরে এল।

প্রভাতকুমার নিষ্ঠুর শিল্পী নন। এমনকি শাস্তি বিধানেও তিনি নিষ্ঠুর হতে পারেননি বরং একধরনের কৌতুকের স্নিগ্ধ হাওয়ায় শাস্তিযোগ্য অপরাধকেও তিনি পুরুষ্কার প্রাপ্তির রমণীয় পরিণতি দান করতে পারেন। যেমন 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটি। রবীন্দ্রনাথের পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে এই পোষ্টমাষ্টারের কোন সাদৃশ্যই নেই। এই পোষ্টমাষ্টারের অদ্ভুত খেয়াল ডাক-ব্যাগ থেকে বিভিন্ন প্রেমপত্র লুকিয়ে পড়া। প্রেমপত্রগুলি পড়তে পড়তে অনেকের হাতের লেখাও তার বিশেষ

পরিচিত হয়ে যায়। তার অদ্ভুত খেয়াল এখানেই থেমে থাকেনি। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে অনুপস্থিত নায়কের proxy দিতে গিয়ে নিজেই নিজের ফাঁদে ধড়া পড়ে গেছেন। এবং প্রহারের চোটে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। পোষ্টাপিসের বারান্দায় তার অচেতন দেহ ফেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু নিষ্ঠুর পরিসমাপ্তি প্রভাতকুমারের গল্পের বৈশিষ্ট্য নয়, তাই এ গল্পের পরিণামও নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়নি। পোষ্টমাষ্টার এমন কৌশল অবলম্বন করলেন যে :

> ''দুইদিন পরে, কলিকাতার কাগজে ছাপা হইল—
>
> ভীষণ ডাকাতি! পোষ্ট অফিস লুট।
>
> —শেষ পর্যন্ত ডাকাতেরা কেহই ধরা পরে নাই। বিমল আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া, সরকারের টাকা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এই বিশ্বাসে সদাশয় গভর্ণমেন্ট তাহাকে ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত করিয়া দিলেন।''[২৯]

'প্রতিজ্ঞপূরণ' গল্পের নায়ক কলেজের নব্যযুবক ভবতোষ হঠাৎ আধ্যাত্মিক জগতে উন্নীত হয়ে পণ করে বসলো কালো মেয়ে ছাড়া বিবাহ করবে না। বিবাহ ঠিকও হয়ে গেল। কিন্তু বিবাহের দিন যত এগিয়ে এলো ততই ভবতোষের প্রতিজ্ঞাবন্ধন ক্রমশ শিথিল হতে থাকলো। অবশেষে যখন সে জানতে পারলো যে মেয়েটি আসলে ফরসা এবং সুন্দরী, শুধুমাত্র তার প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্যই তাকে মিথ্যেকথা বলা হয়েছিল তখন সে হাফ ছেরে বাঁচলো। মানুষের অসম্ভব কল্পনা কীভাবে বাস্তবের আঘাতে ধূলিস্যাৎ হয়ে যায় তারই কৌতুককর চিত্র এই গল্পটি।

'প্রণয় পরিণাম' বাল্যপ্রণয়ের হাস্যমধুর কাহিনি। কৈশোরে প্রবেশ করে বালক-বালিকার আচরণের মধ্যে যে অসঙ্গতির সৃষ্টি হয় তাকেই কৌতুকের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে এ গল্পে। নায়ক মানিকলাল ও নায়িকা কুসুমলতা—পাশাপাশি দুটি পরিবারের বালকবালিকা। নায়কের বয়স চোদ্দ ও নায়িকার বয়স এগারো। ছোট থেকে তারা একসঙ্গ বড় হয়েছে। কিন্তু চোদ্দতে পা দিয়ে নায়ক মাণিকলাল হঠাৎ করেই কুসুমলতার প্রেমে পড়ে গেছে। কাজেই :

> ''মাণিক আর ফুটবল খেলে না, জিম্‌নাষ্টিক করা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াচে—দ্বিপ্রহরে স্কুল পলাইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া কবিতা লেখে। প্রভাতে, সন্ধ্যায় নানা ছলে কুসুমদের বাড়ি গিয়া কুসুমকে দেখিয়া আসে।''[৩০]

শেষপর্যন্ত পিতার প্রহারে তার এই প্রেমের অবসান হয়েছে। শুধু তাই নয় প্রেমিকার বিবাহে প্রচুর লুচিও খেয়েছে সে।

প্রভাতকুমারের আরেক ধরণের গল্প রয়েছে যে গল্পগুলিতে রয়েছে কারুণ্যের স্পর্শ। এ গল্পগুলি মূলত করুণ ও নিষ্ঠুর জীবনের কাহিনি। এ গল্পগুলিকে বলা যেতে পারে হিউমার রসাত্মক। 'ফুলের মূল্য', 'মাতৃহীন', 'আদরিণী', 'কাশীবাসিনী', 'দেবী' ইত্যাদি গল্পগুলি এই শ্রেণীর। ধরা যাক 'মাতৃহীন' গল্পটির কথা। একটি ট্র্যাজিক প্রেমের গল্প। দুজন ভিন্ন দেশীয় যুবক যুবতী এ গল্পের নায়ক নায়িকা। নায়িকা ব্রিটিশ ও নায়ক ভারতীয়। ইংলন্ডের প্রবাসী জীবনে ভারতীয় নায়কটি প্রেমে পড়েছিল ব্রিটিশ যুবতি মিস ক্যাম্বেলের। কিন্তু বাধ সাধলেন ভারতে বসবাসকারি নায়কের পিতা। জাতিচ্যুত হবার ভয়ে কিছুতেই তিনি এ বিবাহে রাজী হলেন না। ছুটে গেলেন লন্ডনে পুত্রকে বোঝাতে। শেষটায় বেকে বসলো মেয়েটি। নায়ক প্রেমিকাকে ভুল বুঝে চলে এল দেশে। সেখানে গিয়ে বিবাহ করলো। আর মেয়েটি আজীবন ত্যাগের মন্ত্রে জীবনকে মহীয়সী করার সাধনায় ব্রতী হল। এরপর জীবন সায়াহ্নে এসে দৈবযোগে যার সঙ্গে তার দেখা হল সে তারই আরাধ্যের পুত্র। তাকে কাছে পেয়ে অমলিন মাতৃস্নেহে তাকেই পুত্র বলে স্বীকার করে নিলেন তিনি। মরবার আগে এইটুকু তৃপ্তি তার অনন্ত জীবনের কঠিন সাধনার একমাত্র প্রাপ্তি।

হাস্যরসিক প্রভাতকুমারের মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে বলা যায় প্রভাতকুমার হাস্যরসিক শিল্পী। কিন্তু তাঁর হাসির মধ্যে কোথাও নিষ্ঠুরতা নেই। কঠিন কঠোর নিষ্ঠুর কাহিনিও তাঁর হাতে তৃপ্তিদায়ক পরিণতি লাভ করে। জীবনকে একধরণের উদার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন। জাতীয় জীবনের কোন গুরতর সমস্যাকে তিনি তুলে ধরেননি। আমাদের সহজ সরল জীবনের ছোট ছোট অনুভূতিগুলিকে হাসির স্নিগ্ধ হাওয়ায় ভরিয়ে দিয়েছেন তিনি। কোনরকম তির্যক দৃষ্টি নয় বরং একধরণের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি তাঁর প্রধান সম্পদ। এরকম দৃষ্টিভঙ্গী আমরা পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কারো মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এখানেই বাংলা হাস্যরসের ধারায় প্রভাতকুমার অনন্য।

এই সময়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন **প্রমথ চৌধুরী** (১৮৬৮-১৯৪৬)। তিনিও ছিলেন হাস্যরসের কারবারি কিন্তু হাস্যরস সৃষ্টির কৌশলে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টির অধিকারী। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন :

> ''করুণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে; আমাদের সুখের জন্য না হোক, স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।''[৩১]

এই আবশ্যিকতার কথা মাথায় রেখেই প্রমথ চৌধুরী গল্পের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সমকালীন অন্যান্য গল্পকারদের গল্পবিষয় ও গল্প উপাদান থেকে অনেকটাই সরে এসে নতুন

বিষয় ও নতুন উপাদান নিয়ে বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে হাজির হলেন তিনি। গল্পের উপাদান প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন :

> ''যা নিত্য ঘটে, তার কথা কেউ শুনতে চায় না, ঘরে যা নিত্য খাই, তাই খাবার লোভে আর কে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়? যা নিত্য ঘটে না, কিন্তু ঘটতে পারে, তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান।''[৩২]

প্রমথ চৌধুরী এই কল্পবাস্তবকেই তাঁর গল্পের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ লেখাগুলি হাস্যরসে ভরপুর। তাঁর যে কোন শ্রেণীর গল্পই তা সে প্রেমের গল্প, ভূতের গল্প, অতীত দিনের কাহিনি নিয়ে লেখা গল্প যাইহোক সবেতেই বিদ্রূপ পরিহাসের স্পর্শ অনুভূত হয়। যেমন 'চার ইয়ারী কথা' (১৯১৬)। এটি চারটি গল্পের সমষ্টি। এক দুর্যোগপূর্ণ সন্ধ্যায় ক্লাবঘরে বসে চারজন বন্ধু মদের গ্লাস হাতে আপন আপন ব্যর্থ প্রেমের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছে। সৌন্দর্যের প্রতি এই চারজন যুবকেরই রয়েছে এক অদম্য আকর্ষণ। আপাত ব্যঙ্গের নির্মোকে গল্পকার এই সৌন্দর্য আকর্ষণকে বিশিষ্ট করে তুলেছেন। প্রেমের অসঙ্গতির নানা চিত্রকে প্রমথ চৌধুরি রসিকতার ছলে তুলে ধরেছেন তাঁর ছোটগল্পে। শুধু প্রেমের বিষয় নয় অন্যান্য বিষয় নিয়েও গল্প লিখেছেন তিনি। 'রাম ও শ্যাম' গল্পে দেশীয় রাজনীতির চিরন্তন দুর্বলতাকে প্রমথ চৌধুরী ব্যঙ্গ করেছেন। স্বরাজের নামে দলাদলি, নিজেদের মধ্যে হিংসা প্রভৃতিকে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন এই গল্পে। রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক গল্প হিসেবে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ফরমায়েসী গল্প'-এ প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিকতা এবং নানা অসম্ভাব্য হাস্যকর গাঁজাখুরি উপাদানকে কৌতুকের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। চাটুকার ঘোষাল গল্প বলতে বসে অন্নদাতা রায় মহাশয় ও তার সভাপন্ডিতের নির্দেশানুযায়ী যেভাবে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটিয়ে দিল তা অত্যন্ত হাস্যকর। বাংলাদেশের উচ্ছ্বাসপ্রবণ রোমান্স পাঠকের প্রতিও বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হয়েছে এই গল্পে। 'ফার্স্টক্লাস ভূত' গল্পে গাঁজার নেশায় অনাবিল হাস্যরসের প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী হাস্যরসের গল্প লিখেছেন ঠিকই কিন্তু মনে রাখতে হবে তাঁর গল্পগুলির বিষয় কিন্তু হাস্যরসাত্মক নয়। গল্প পড়া শেষ হল অমনি পাঠকমন হাসিতে উদ্বেল হয়ে উঠল এমন গল্প প্রমথ চৌধুরী লেখেননি। তাঁর গল্পে হাসির প্রসঙ্গ এসেছে বুদ্ধিপ্রধান মন্তব্যে, শব্দের তির্যক ব্যবহারে। একধরনের অভিজাত নাগরিক মন নিয়ে তিনি তাঁর গল্পের বক্তব্যকে সাজিয়ে তুলেছেন। তাই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন :

''প্রমথবাবুর হাস্যরস সৃষ্টির প্রণালী সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁহার প্রধান ভঙ্গী হইতেছে সৃজনী শক্তির আবেশময়তার সহিত সমালোচনা শক্তির অতন্দ্রিত বিচার-বুদ্ধির এক প্রকারের অদ্ভুত হাস্যকর সমাবেশ। 'চারইয়ারী কথা', 'নীল লোহিতে'র আদি প্রেম— প্রভৃতি উপন্যাসে এই বৈশিষ্ট্য অনায়াসেই প্রত্যক্ষ হয়।''[৩৩]

প্রমথ চৌধুরীর গল্প প্রসঙ্গে তাঁর গল্পকথন রীতিটি বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। তাঁর অধিকাংশ গল্পের মধ্যে রয়েছে একটি মজলিশী ভাব। একজন গল্প বলছেন আর একদল গল্প শুনছেন। কখনো কখনোও শ্রোতারা নানা মন্তব্য জুড়ে দিচ্ছেন এবং হল্লা করে গল্পের সমাপ্তিও ঘটিয়ে দিচ্ছেন। গল্পকথনের এই বৈশিষ্ট্য আমাদের হাস্যরসিক শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথের কথা মনে করিয়ে দেয়।

বাংলা ছোটগল্পে **কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮৬৩-১৯৪৯) ছিলেন যথার্থ অর্থেই দাদামাশায়। তাঁর হাসির গল্পগুলি বহুদিন বাঙ্গালি পাঠককে ভুলিয়ে রেখেছিল। প্রমথ চৌধুরীর মত নাগরিক জীবনের কৃত্রিম আধিপত্য নয় বরং সকল প্রকার কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত গ্রামীণ জীবন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। সদালাপী মজলিশিপ্রাণ এই মানুষটি আড্ডার মেজাজে প্রাণখোলা হাসি উপহার দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যকে। তিনি নিছক হাস্যরসস্রষ্টা নন কারণ হাস্যরসস্রষ্টা যিনি তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য যেনতেন প্রকারে হাস্যরস সৃষ্টি। কিন্তু কেদারনাথ হাস্যরসিক সাহিত্যিক। হাসির আড়ালে জীবনরস উদঘাটনই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'আমরা কি ও কে' (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ), 'কবলুতি' (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ), 'পাথেয়' (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ), 'দুঃখের দেওয়ালী' (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ), 'মা ফলেষু' (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), 'সন্ধ্যা শঙ্খ' (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) ও 'নমস্করী' (১৩৫১ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি।

হাস্যরসিক শিল্পী হিসেবে কেদারনাথের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজ। সমাজের নানা অসঙ্গতি অন্তঃসারশূন্যতা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দিককে হাসির মোড়কে কিছুটা ব্যঙ্গ মিশিয়ে পরিবেশন করেছেন তিনি। প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে তাঁর একধরণের আসক্তি ছিল। তবে প্রাচীনের সবকিছুই তাঁর কাছে ত্রুটিমুক্ত মনে হয়নি। তাই অতীত দিনের মানুষের দোষ-দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্খলন-পতন, নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী মানসিকতা লক্ষ করা যায় তাঁর গল্পে। 'আমরা কি ও কে' গল্পগ্রন্থে এই প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার নানাচিত্র সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। দেশীয় মানুষদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বিরুদ্ধে মৃদু কটাক্ষও রয়েছে এতে। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে বাঙ্গালীর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকে কটাক্ষ করেছেন এই বলে :

> ‘‘তোতাগুলোও ঘোড়ার মতই ভিজে ছোলা খায়, আর বড় বড় বুলি আওড়ায়, কই পায়ের ছেকলটাও তো ছিঁড়তে পারে না, তবে বলা যায় না, ছোলা খেতে খেতে কালে তারা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় দাঁড়িয়ে যেতে পারে।’’[৩৪]

‘আনন্দময়ী দর্শন’ গল্পে জাতীয় চরিত্রের নানা ত্রুটির প্রতি লেখকের মৃদু কটাক্ষ আমরা লক্ষ্য করি। এখানেও রয়েছে বাঙ্গালী চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াস। ‘পাথেয়’ গল্পগ্রন্থের ‘ধম্মা’, ‘হারু’ প্রভৃতি গল্পে বাঙ্গালী নারীজাতির ঈর্ষাকাতরতা, বাঙ্গালীর নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা ও অকৃতজ্ঞতার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। ‘মা ফলেষু’ গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে রয়েছে বেকার জীবনের ভাগ্যবিড়ম্বনা, শিক্ষিত বাঙ্গালীর আত্মাভিমান প্রভৃতির প্রতি কটাক্ষ।

কেদারনাথের গল্পের হাস্যরস সৃষ্টির একটি বড় উৎস তাঁর বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গীর ব্যবহার। কথাকে উল্টে পাল্টে, বাঁকিয়ে ও মোচড় দিয়ে তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে তা শুনতে শুনতে আমরা নির্ভেজাল কৌতুক অনুভব করি। চরিত্রদের কথোপকথনে ভুল উচ্চারণ এই কৌতুকের মাত্রাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। ‘দাদার দুরভিসন্ধি’ গল্প থেকে এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

> ‘‘—কিরে ভান্টা আসা হায় কেত্তাখন? এই তোমার কথাই ভাবতা থা—গরীব লোকের এক পয়সা না যায়। কিন্তু যো দিনমে কোই গরু, জরু নেই ছোড় দেতা, আর তুমি কি বোলকে নোকরি, যা গরু জরুকা বাবা বললেই হয়, সেটা ছেড়ে দিলে? হিন্দুকা বাচ্চা একটু শাস্ত্রজ্ঞান তো থাকা উচিত।’’[৩৫]

প্রমথনাথ বিশীর (১৯০১-১৯৮৫) গল্পগুলিও বাংলা হাস্যরসাত্মক গল্পধারায় বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। বহুবিচিত্র বিষয় নিয়ে গল্প লিখলেও রঙ্গব্যঙ্গমূলক গল্প রচনায় প্রমথনাথ বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর এ জাতীয় গল্পের সংখ্যা প্রচুর। প্রমথনাথের হাস্যরসের গল্পগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—রঙ্গব্যঙ্গমূলক ও বিশুদ্ধ কৌতুকরসাত্মক। ‘গাধার আত্মকথা’, ‘উতঙ্ক’, ‘গনক’, ‘চাকরিস্তান’, ‘টিউশন’, ‘অর্থপুস্তক’, ‘প্রফেসর রামমূর্তি’, ‘গদাধর পন্ডিত’ প্রভৃতি গল্পগুলি রঙ্গব্যঙ্গমূলক। আর তাঁর বিশুদ্ধ কৌতুকরসের গল্পগুলি হল ‘থার্মোমিটার’, ‘অদৃষ্টসুখী’, ‘রাশিফল’, ‘কৃষ্ণনারায়ণ সংবাদ’, ‘পকেটমারের প্রতিকার’, ‘এলার্জ্জি’, ‘এলসেশিয়ান ডগ’ , ‘একশ চুয়াল্লিশ ধারা’, ‘ফ্যামিলি প্ল্যানিং’, ‘গুরুমারা চেলা’, ‘চেতাবনী’, ‘একগজ মার্কিন ও একচামচ চিনি’, ‘সাবানের টুকরো’, ‘শিখ পুতুল’, ‘রাঘব বোয়াল’, ‘চাচাতুয়া’, ‘শার্দূল’, ‘ছবি’, ‘তিমিঙ্গিল’, ‘পুকুর চুরি’, ‘ছাপ সন্দেশ’, ‘দর্জি ও প্রেম’, ‘নহুষের অতৃপ্তি’, ‘রজ্জুতে সর্প’, ‘বাইশ বৎসর’, ‘কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ’, ‘ভগবান ও বিজ্ঞাপন দাতা’, ‘অটোগ্রাফ’, ‘বাঘদত্তা ’, ‘ভেজিটেবল বোম’, ‘মারণ যজ্ঞ’, ‘গঙ্গার

ইলিশ', 'পূজা সংখ্যা' প্রভৃতি। এই সমস্ত গল্পের মধ্য দিয়ে প্রমথনাথ সমাজের নানা অসঙ্গতিকে হাস্যরসের মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। পত্রিকা সম্পাদক থেকে শুরু করে সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, চোরাকারবারী, হাতুরে ডাক্তার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নানা অপকীর্তিকে ব্যঙ্গের আঘাতে ধরাশায়ী করেছেন। যেমন 'কাঁচি' গল্পে সাংবাদিকদের নিয়ে প্রমথনাথ রসিকতা করেছেন এভাবে :

> ''পকেট নয় গো, পকেট নয়—পিরামিড হাসিয়া উঠিল। ওঃ সে কী হাসি! যেন ভূমিকম্পে খানকতক পাথর গড়াইয়া পড়িল। হাসি থামিলে বলিলেন—কাগজ! কাগজের কাটিং কেটে সেঁটে দেবে! এরই নাম জার্নালিজম, এতে লেখাপড়ার কী দরকার? আমরা সরস্বতীর দর্জি।''[৩৬]

'গন্ডার' গল্পে পত্রিকা সম্পাদকের গায়ের চামরাকে গন্ডারের চামরা বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। 'থার্মোমিটার' গল্পে শিশুটির জ্বর না কমার প্রকৃত কারণ রোগের তীব্রতা নয়, থার্মোমিটার যন্ত্রটিই আসলে ছিল অকেজো। এই অকেজো থার্মোমিটার দিয়ে ভুল চিকিৎসা করে সুস্থ শিশুকে অসুস্থ করে তোলা হয়েছে। হাতুড়ে ডাক্তারের প্রতি কটাক্ষ এ গল্পের মূল লক্ষ্য। 'চিত্রগুপ্তের অ্যাডভেঞ্চার' গল্পে রাজনৈতিক নেতাদের তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে। ক্ষমতা ও অর্থের জোড়ে তারা কীভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করে দেয় তা কৌতুকরভাবে তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য গল্পে। প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পে হাস্যরসের প্রকৃতি সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন :

> ''তাঁর ব্যঙ্গ কোথাও তীক্ষ্ম ও মর্মভেদী—যার উদ্দেশে বর্ষিত হয় তার চর্ম ভেদ করে মর্মে প্রবেশ করে দাহ সৃষ্টি করে, আবার কোথাও তা নির্মল কৌতুকে স্নিগ্ধ, কিছু সময়ের জন্য পাঠকচিত্তে অনাবিল হাস্যরসের সঞ্চার করে আনন্দরসধারায় সিক্ত ও প্রসন্ন করে তোলে।''[৩৭]

আসলে প্রমথনাথের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর নানা অসঙ্গতিগুলিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে জর্জরিত করে জাতির প্রকৃত চেতনার জাগরণ ঘটানো। যখন তিনি কথা দিয়ে জাতির চৈতন্য জাগ্রত করতে ব্যর্থ হয়েছেন তখন তিনি জাতির উদ্দেশে ঢিল ছুঁড়বার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই সময়ের আরেকজন শিল্পী **রবীন্দ্রনাথ মৈত্র** (১৮৯৭-১৯৩৩)। সাহিত্য রচনায় তিনি ছিলেন কল্লোলের সমসাময়িক। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ —এই সময় সীমায় তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। কল্লোলের সমসাময়িক হলেও কল্লোলের মানসিকতার সঙ্গে তার মিল ছিল না। তিনি ছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র গোষ্ঠীভুক্ত। 'শনিবারের চিঠি'র লেখা প্রায়ই রঙ্গ ব্যঙ্গের দিকে ঝুঁকতো। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র সেই ধারাটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভাষায় সমাজ ও মানুষের নানা বিকার ও অসঙ্গতিগুলিকে তিনি আক্রমণ করেছেন। কখনো আক্রমণ করেছেন

নগর জীবনের কৃত্রিমতাকে, কখনো আক্রমণ করেছেন ভন্ড স্বদেশিয়ানাকে। আবার কখনো ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ হয়েছে। পূজারি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কীভাবে অর্থবানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে থাকে আর দরিদ্রদের অবহেলা করে থাকে তাঁর একটি সুন্দর বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন 'তীর্থে' (থার্ড ক্লাশ) গল্পে পূজারি বিলাস হালদারের মধ্য দিয়ে। রামু মালী তার ছেলের অসুখ সারাতে এসে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকেছে। বিলাস হালদার তাকে দেখে বলেছে :

> ''পথ ছাড়! পথ ছাড়! রামু সরিয়া পথ দিল। বিলাস হালদার আসিলেন। আজ তাহার পালি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বাহুতে সোনার বিছা—তাহাতে গন্ডাদুয়েক নানা আকারের কবচ। ললাটে রক্ত চন্দনের রেখা। রামু সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া রহিল, ঠাকুর আমার পূজোটা?'' দাঁড়িয়ে থাক, ক'টাকার পূজো?'' পাঁচসিকের, দাঁড়িয়ে থাক।''[৩৮]

অথচ অর্থবান কুসুম বাঈজী যখন পূজো দিতে এসেছে তখন বিলাস হালদার তাকে যত্ন আপ্যায়ন করে পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

কোনো কোনো গল্পে পত্রিকা সম্পাদকের দায়সারা মনোভাবকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করেছেন। যেমন 'একটি আধুনিক গল্প'-এ এক পত্রিকা সম্পাদক লেখকের কাছে হাজির হয়েছেন সেই মুহূর্তেই একটি গল্প লিখে দেওয়ার জন্য :

> ''দেরী করবার উপায় নেই, কাল থেকেই ছাপা শুরু হবে। একটা গল্প চাই, একটি রস রচনা, সেই সঙ্গে সম্ভব হলে একটা কবিতা, নিতান্ত না পারলে আপনার উপন্যাসখানির প্রথম অংশ—দুটি পরিচ্ছেদ।... সভয়ে তাঁর দিকে চাহিয়া কহিলাম, ''কাল হলে হয় না?'' সম্পাদক কহিলেন, ''না''। এক্ষুণি। বরং আমি বসছি, আপনি কিছু জল খাবার আর চা আনিয়ে দিন। আমি বৈঠকখানায় খবরের কাগজটা দেখি গে!'' সম্পাদক মহাশয় বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, ভাবিয়া কহিলাম এত তাড়াতাড়ি কি লিখিব? কিছুই তো আসছে না মাথায়! ''সম্পাদক বারান্দা হইতে ধিক্কার দিলেন, কী আপনারা! নকুলবাবু তিন ঘন্টায় একটা গল্প লেখেন, মন্তুবাবু চার গল্প এক সঙ্গে ফেঁদে নিয়ে চার প্রহরে চারটে শেষ করে ফেলেন, দাশুবোস বায়োস্কোপ দেখে ফিরে এসেই, গল্প লিখতে কি লাগে?''[৩৯]

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁর গল্পগুলিতে দেশ ও সমাজের নানা অসঙ্গতিগুলিকে বিদ্রূপ করেছেন বটে কিন্তু কখনোই তিনি ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করেননি। অনেক সময়ই তাঁর রচনা হয়ে উঠেছে একটু বেশি তীব্র। আঘাত হয়েছে কঠিন কিন্তু মানুষের শুভ বুদ্ধির প্রতি তাঁর

যথেষ্টই আস্থা ছিল। তাই সহানুভূতির সঙ্গে তিনি মানুষকে দেখেছেন। সজনীকান্ত দাসের একটি গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন :

> ''বিদ্রূপ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু তথাপি বাঙলা দেশের পাঠক সাধারণের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। যে দেশে কমলাকান্ত মরিয়াও মরেন নাই, সে দেশে মধু ও হুলের আস্বাদ পর্যায়ক্রমে উপভোগ করিবার মত ক্ষমতাশালী পাঠকের অভাব হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।''[৪০]

পাঠক ও মানুষের প্রতি এই বিশ্বাস রেখেই রবীন্দ্রনাথ মৈত্র তাঁর হাস্যরসাত্মক গল্পগুলি রচনা করেছেন।

এরপর উল্লেখ করতে হয় **পরিমল গোস্বামীর** (১৮৯৭-১৯৭৬) কথা। বাংলা কথাসাহিত্যে ব্যঙ্গরসের ক্ষেত্রটিকে সমৃদ্ধ করতে পরিমল গোস্বামীর অবদান অনস্বীকার্য। অন্যান্য ব্যঙ্গরসের লেখকদের মতো তিনিও তাঁর ব্যঙ্গরসের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন সমসাময়িক জাতীয় জীবনের নানা অসঙ্গতি থেকে। শিক্ষা রাজনীতি, অর্থনীতি, চিকিৎসা, বিচারব্যবস্থা, ধর্মীয় ভন্ডামি ইত্যাদি এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে পরিমল গোস্বামী তাঁর ব্যঙ্গবান নিক্ষেপ করেননি। সাহিত্যিক ব্যঙ্গ সম্পর্কে তাঁর একটি স্পষ্ট ধারণা ছিল। পরিমল গোস্বামীর নানা উক্তি থেকে একথা বোঝা যায়। তিনি বলেছেন:

> ''স্যাটায়ারকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার জন্মই বিদ্বেষ থেকে। অর্থাৎ সব সময়েই তা বিদ্বেষপ্রসূত। তবে বিদ্বেষপরিপূর্ণ হলে তা যে উচ্চ শ্রেণীর স্যাটায়ারের পথে বাধা সৃষ্টি করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোন উপন্যাসের প্লট যেমন উপন্যাস নয়, গানের স্বরলিপি যেমন গান নয়, তেমনি শুধু বিদ্বেষ স্যাটায়ার নয়, অর্থাৎ ব্যঙ্গ-সাহিত্য নয়। স্যাটায়ারের মূলে বিদ্বেষ, কিন্তু সেই বিদ্বেষ একটা বিশেষ চেহারায় প্রকাশিত হলে তবে তা স্যাটায়ার হয়, ব্যঙ্গ হয়।...ব্যঙ্গ যদি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকে তবেই তা ব্যঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হ'তে পারে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা অভদ্র আক্রমণ উদ্দেশ্যসাধনে সফল হলেও তার সাহিত্য-মূল্য বেশি হয় না। মাথায় ইঁট মারা ব্যঙ্গ হতে পারে—কিন্তু ব্যঙ্গ-সাহিত্য নয়।''[৪১]

ব্যঙ্গ সাহিত্য সম্পর্কে এই স্পষ্ট ধারণা নিয়েই পরিমল গোস্বামী তাঁর সাহিত্যিক ব্যঙ্গগুলি রচনা করেছেন। বঙ্কিম যেমন তাঁর লোকরহস্যের কোন কোন প্রবন্ধে পশুর রূপকে মনুষ্যস্বভাবকে ব্যঙ্গ করেছেন পরিমল গোস্বামীও তেমনি পশুদের রূপকে মানুষের নানা অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করেছেন। যেমন 'বাঘের গলায় হাড়' গল্পে বাঘের মুখ দিয়ে আধুনিক চিকিৎসকদের যথার্থ স্বরূপ তুলে ধরেছেন তিনি। তারা কীভাবে সাধারণ মানুষদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের সঙ্গে প্রতারণা

করেন তার ব্যঙ্গাত্মক চিত্র রয়েছে গল্পটিতে। 'অভিনেতা গাধা' গল্পটিতে বাঙ্গালীর অন্যের প্রতি ঈর্ষাকাতরতাকে তুলে ধরেছেন লেখক। অন্যের প্রতি ঈর্ষাকাতরতাবশতঃ বাঙ্গালী কীভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করেও তার সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করে তা বাঘের ছদ্মবেশধারী এক গাধার জবানিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। বাঘের ছদ্মবেশধারী গাধাটি একটি সত্যিকারের বাঘের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার পরে প্রকৃত বাঘ তাকে বলেছে : ''আমরা বাঘ, আমরা অন্তরে বাইরে বাঘ, কিন্তু তোমরা অন্তরে গাধা বাইরে বাঘ।'' এর উত্তরে ছদ্মবেশধারী গাধা বলেছে :

> ''তুমি সভ্যসমাজে বাস করনি, তাই ওরকম বলছ। তুমি নিতান্তই জানোয়ার, ষোল আনাই পশু, তাইতো এরকম বিশুদ্ধবাদী হয়েছো কিন্তু মানুষের সমাজে বাস করে সমস্ত বিষয়েই আমরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছি।''[৪২]

বর্তমান সময়ে ছদ্মবেশধারী মানুষদের অন্তঃস্বভাবকে পরিমল গোস্মামী এরকমভাবেই তাঁর গল্পগুলিতে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন। সত্যিই তাঁর ব্যঙ্গবাণ যেন ছুরির ফলার ন্যায় তীক্ষ্ণ। তাই প্রমথনাথ বিশী পরিমল গোস্বামীর ব্যঙ্গগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন :

> ''পরিমলবাবুর ব্যঙ্গগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ব্যঙ্গ ইস্পাতের ছোড়ার ন্যায় অত্যন্ত হ্রস্বকায়, তাই বলিয়া ধার কম নয়, এবং উজ্জ্বলতাও যথেষ্ট। ইস্পাতের ছোরাখানা লেখকের কোমরবন্ধে কোথায় যে লুক্কায়িত সবসময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না, হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া আঘাত করে, আবার বিদ্যুতের চমকের মত মেঘান্তরালে মিলাইয়া যায়।''[৪৩]

এ ছাড়া এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হয়েছিলেন একদল সাহিত্যিক যারা হাস্যরসের গল্পকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), অশোক চট্টোপাধ্যায়, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭) ও শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৫-১৯৮১)। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শিবরাম চক্রবর্তী তো বাংলা হাস্যরসের ধারায় দুটি ভিন্ন পথই নির্মাণ করে নিয়েছেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মতো হিউমারিষ্ট বাংলা সাহিত্যে খুব কমই আছেন। তাঁর গল্পগুলিতে যেভাবে একই সঙ্গে হাসি ও অশ্রুর আভাস আছে তা বাংলা সাহিত্যে আর কারও মধ্যে দেখা যায় না। তাঁর গল্পগুলি একই সঙ্গে পাঠককে হাসায় ও কাদায়। 'রানুর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ', 'রাণুর কথামালা', 'বরযাত্রী' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলির মধ্য দিয়ে বিভূতিভুষণ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে হাসির গল্পকার হিসেবে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত। আর শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পে রয়েছে নির্ভেজাল হাসি। এ হাসির কোন জাত নেই। এ হাসিকে স্যাটায়ার, কিম্বা উইট কিম্বা হিউমার কোন অভিধায় অভিহিত করা যায় না। গুরু গম্ভীর তত্ত্ব

কিম্বা গভীর জীবন দর্শনকে দূরে সরিয়ে রেখে শিবরামের হাসি পাঠককে এক সত্যিকারের হাসির জগতে নিয়ে যায়। বাংলা হাস্যরসের গল্পের ধারায় তাঁর স্থান অনন্য।

বাংলা হাস্যরসের উপরোক্ত ধারাতেই আবির্ভূত হয়েছেন বাংলা সাহিত্যের তিন হাস্যরসিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯)। বাংলা হাস্যরসের ধারায় এই তিন হাস্যরসিকই স্বতন্ত্র পথের পথিক। তাঁরা বাংলা দেশের তিন ভিন্ন সময়কে হাস্যরসিকের চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য এক হলেও নিরীক্ষণ বিন্দু ছিল আলাদা। এই তিনজন হাস্যরসিকের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে এবারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

উল্লেখসূচি :

১) ক) আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, জগদীশ ভট্টাচার্য, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৬৭।

খ) প্রবন্ধ: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সমগ্র—ভূমিকা, বঙ্কিমরচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ৭৭ এ, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯, পৃ. ৯১৭।

২) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাই-ভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩০০।

৩) ঈশ্বর গুপ্ত: সাংবাদিক কবি ও গদ্য শিল্পী, রেণুপদ ঘোষ, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা ৭০-০০৭৩, ৬ বঙ্কিম, পৃ. ১৫১।

৪) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাই-ভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩০১।

৫) তদেব, পৃ. ৩০১।

৬) প্রবন্ধ: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সমগ্র—ভূমিকা, বঙ্কিম রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ৭৭ এ, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯, পৃ. ৯১৬।

৭) তদেব, পৃ ৯১৮।

৮) তদেব, পৃ ৯১৮।

৯) 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, অজিতকুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, পঞ্চম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ: ২০১৫, পৃ. ২১৫।

১০) তদেব, পৃ. ২১৯-২২০।

১১) 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', উদ্ধৃত: বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩৩০।

১২) বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, অজিতকুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ-২০১৫, পৃ. ২৪১।

১৩) উদ্ধৃত: রচনা পরিচিতি, বঙ্কিমরচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ৭৭ এ, পটঙ্গডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯, পৃ. (x)।

১৪)ক) প্রবন্ধ: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সমগ্র—ভূমিকা, বঙ্কিম রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ৭৭ এ, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-০৯, পৃ. ৫৩৬।

খ)'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, অজিত কুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, পঞ্চম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ: ২০১৫, পৃ. ২৪৭।

১৫) রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, প্রমথনাথ বিশী, পৃ: ৫৭, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, বৈশাখ১৪১৭, কলকাতা, পৃ. ৫৭।

১৬) 'প্রহাসিনী', রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পৃ. ৯৩৭।

১৭) ছিন্নপত্রাবলী ৪৭, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্রাবলী ও রবীন্দ্রনাথ, সত্রাজিৎ গোস্বামী, জয়দুর্গা লাই-ব্রেরী, ৮ এ ও ৫ বি, কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০-০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১০৫।

১৮) 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা', 'পঞ্চভূত', রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা, ১৭ পৃ. ৯৩৭।

১৯) 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা', পঞ্চভূত, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পৃ. ৯৩৭।

২০) রবীন্দ্র সাহিত্যে হাস্যরস, সরোজকুমার বসু, কলিকাতা-১২, হিন্দুস্থান বুক ডিপো লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ১লা আষাঢ়, ১৩৫৭, পৃ. ৮২।

২১) 'সে', রবীন্দ্রনাথ।

২২) 'অধ্যাপক', গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ।

২৩) 'অধ্যাপক', গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ।

২৪) 'দর্পহরণ', গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ।

২৫) বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, অজিত কুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, পঞ্চম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ: ২০১৫, পৃ. ২৯১।

২৬) উদ্ধৃত : বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, অজিত দত্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি, পৃ. ৩০৯।

২৭) বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, অজিতকুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, পঞ্চম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : ২০১৫, পৃ. ২১৭।

২৮) বাংলা ছোটগল্প, শিশিরকুমার দাশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৪৯।

২৯) 'পোষ্টমাষ্টার', শ্রেষ্ঠগল্প, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৩০) 'প্রণয় পরিণাম', শ্রেষ্ঠগল্প, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৩১) দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য: গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬৩।

৩২) দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য: গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬৩।

৩৩) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, পুনর্মুদ্রণ ২০০১, পৃ. ৩৮৮।

৩৪) 'আমরা কি ও কে' ('আমরা কি ও কে'), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা—বিবর্ত্তন, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৪, পৃ. ১৩২ উদ্ধৃত: বাংলা কথাসাহিত্যে হাস্যরস, ড. তপনকুমার ধাড়া, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পৃ. ৬৪।

৩৫) 'দাদার দুরভিসন্ধি' ('দাদামশায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দি বিহার সাহিত্য ভবন লিমিটেড, ৫ ডফ্ লেন, কলিকাতা-৬, আষাঢ়, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৭, (১৯৫০), পৃ. ৭৭ উদ্ধৃত: বাংলা কথাসাহিত্যে হাস্যরস, ড. তপনকুমার ধাড়া, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পৃ. ৯৩।

৩৬) প্রমথনাথ বিশীর গল্পসমগ্র, কাঁচি, পৃ:৪২, উদ্ধৃত: ছোটগল্পের অঙ্গণে প্রমথনাথ বিশী, ড. সতী চক্রবর্তী, অর্পিতা প্রকাশনী, ১ কে রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, পৃ. ১৩০।

৩৭) কালের পুত্তলিকা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, কার্তিক১৪০৬, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ২৯৮।

৩৮) 'তীর্থে'(থার্ড ক্লাশ); রবীন্দ্রনাথ মৈত্রঃ ১২ই পৌষ, ১৩৩৫ (১৯২৮খ্রীঃ) পৃ.১৭, উদ্ধৃত: বাংলা কথাসাহিত্যে হাস্যরস, ড. তপনকুমার ধাড়া, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পৃ. ১৩০।

৩৯) একটি আধুনিক গল্প (ত্রিলোচন কবিরাজ), রবীন্দ্রনাথ মৈত্রঃ, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স্ ২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯২-৯৩, উদ্ধৃত: বাংলা কথাসাহিত্যে হাস্যরস, ড. তপনকুমার ধাড়া, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পৃ. ১১৮-১১৯।

৪০) 'মধু ও হুল', সজনীকান্ত দাস, রঞ্জন পাবলিশার্স, ২৫।২ মোহন বাগান রো, কলিকাতা, ১ম সং ১৩৩৮-আশ্বিন, উদ্ধৃত: বাংলা কথাসাহিত্যে হাস্যরস, ড. তপনকুমার ধাড়া, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পৃ. ১২৩।

৪১) 'ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী', পরিমল গোস্বামী : কলিকাতা-১, ইষ্টলাইট বুক হাউস, স্ট্র্যান্ড রোড, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৪, ভূমিকা, উদ্ধৃত: বাংলা কথাসাহিত্যে হাস্যরস, ড. তপনকুমার ধাড়া, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পৃ. ১৬৮।

৪২) 'অভিনেতা গাধা'(মারকে লেঙ্গে), পরিমল গোস্বামী: কলিকাতা-৬, রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, প্রকাশ-৩১ শে ভাদ্র, ১৩৫০(১৯৪৩), পৃ:১১-১২, উদ্ধৃত: বাংলা কথাসাহিত্যে হাস্যরস, ড. তপনকুমার ধাড়া, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পৃ. ১৬৪।

৪৩) পরিমল গোস্বামী : 'পরিমল গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প', কলিকাতা-৪, বিহার সাহিত্য ভবন লিমিটেড, ২৫/২ মোহনবাগান রো; ১ম প্রকাশ- মার্চ ১৯৫৪, ভূমিকা। উদ্ধৃত : বাংলা কথাসাহিত্যে হাস্যরস, ড. তপনকুমার ধাড়া, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পৃ. ১৬৪।